জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস ISSN 2519-5816
ভলিউম-১৫ , সংখ্যা-১ DOI : https://doi.org/10.3329/jnujarts.v15i1.87794
জানুয়ারি-জুন ২০২৫ Page: 91-100

রবীন্দ্রনাথের পূজা পর্যায়ের গানঃ ঈশ্বর ও প্রকৃতি অনুষঙ্গ

মো. মাইদুল হক*

Abstract

In this research titled "Rabindranath's Songs of the 'Puja' Phase: The Presence of the Divine and Nature," we explore how the themes of divinity and nature are interwoven within the devotional songs composed by the eminent Bengali musician and poet Rabindranath Tagore. We examine how Rabindranath employed elements of nature to express his spiritual thoughts. How did he use various natural settings and phenomena in his devotional songs? Often, nature and the divine appear to merge into one essence. At other times, nature plays an inevitable and essential role in conveying a divine experience.

To undertake this study, we have selected a number of songs from Rabindranath's Puja (worship) phase. Using textual analysis, comparative methods, and descriptive approaches, we observe that in these devotional compositions, God is undoubtedly present, but nature, too, emerges as a vital and recurring theme—often indispensable. These songs transform Rabindra Sangeet—particularly his devotional pieces—into a profound medium of spiritual and aesthetic realization, where the sacred and the sensory beautifully converge.

মুখ্যশব্দ: রবীন্দ্রসংগীত, পূজা-পর্যায়, অনুষঙ্গ, ঈশ্বর, প্রকৃতি

*এম. ফিল গবেষক, সংগীত বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) বাংলা গানের ইতিহাসে একজন সার্থক বাকগেয়কার।[১] রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমগ্র সংগীতকে লিপিবদ্ধ করেছেন 'গীতবিতানে'। 'গীতবিতান' প্রথম প্রকাশিত হয় তিনটি খণ্ডে কালানুক্রমিক বিন্যাসে যথাক্রমে আশ্বিন ১৩৩৮ এবং শ্রাবণ ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে। কালানুক্রমিক বিন্যস্ত 'গীতবিতান' গীতিকাব্যরূপে পাঠযোগ্য ছিল না, যা সাধারণ পাঠকের কাব্য-রসবোধে ব্যাঘাত ঘটিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে আশ্বিন ১৩৭১ এ প্রকাশিত 'অখণ্ড গীতবিতান' এর বিজ্ঞাপনে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন-

> ...তাতে কেবল যে ব্যবহারের পক্ষে বিঘ্ন হয়েছিল তা নয়, সাহিত্যের দিক থেকে রসবোধের ক্ষতি করেছিল। সেইজন্য এই সংস্করণে ভাবের অনুষঙ্গ রক্ষা করে গানগুলি সাজানো হয়েছে। এই উপায়ে সুরের সহযোগিতা না পেলেও, পাঠকেরা গীতিকাব্যেরূপে এই গানগুলির অনুসরণ করতে পারবেন।[২]

ভাবের অনুষঙ্গকে বজায় রেখে রবীন্দ্রনাথ সমগ্র 'গীতবিতান'কে 'পূজা', 'স্বদেশ', 'প্রেম', 'প্রকৃতি', 'বিচিত্র', 'আনুষ্ঠানিক', মোট ছয়টি ভাগে বিভক্ত করেছেন। বিষয় স্পষ্ট করতে 'পূজা', 'প্রেম' ও 'প্রকৃতি' পর্যায়কে আবার আলাদা আলাদা উপপর্যায়ে ভাগ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রায় তেইশশো গানের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গান রচনা করেছেন পূজা পর্যায়ের, যার সংখ্যা ৬১৭ টি। সমস্ত পূজাপর্যায়ের গানকে বিবেচনা করলে আমরা লক্ষ করি সুচিন্তিতভাবে বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে তিঁনি পূজা পর্যায়ের গানগুলোকে যথাক্রমে 'গান', 'বন্ধু', 'প্রার্থনা', 'বিরহ', 'সাধনা ও সংকল্প', 'দুঃখ', 'আশ্বাস', 'অন্তর্মুখে', 'আত্মবোধন', 'জাগরণ', 'নিঃসংশয়', 'সাধক', 'উৎসব', 'আনন্দ', 'বিশ্ব', 'বিবিধ', 'সুন্দর', 'বাউল', 'পথ', 'শেষ', 'পরিণয়', মোট ২১টি উপপর্যায়ে বিভক্ত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের পূজা পর্যায়ের গানে অনুষঙ্গ হিসেবে 'প্রকৃতি' একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। রবীন্দ্রনাথের গানে প্রকৃতি শুধুমাত্র বাহ্যিক পরিবেশের সৌন্দর্য নয়, মানব হৃদয়ের অন্তর্গত অনুভূতিগুলোর গভীরতম প্রতিফলন। রবীন্দ্রনাথের পূজা পর্যায়ের গানে প্রকৃতির যে অনুষঙ্গগুলো এসেছে তা প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের আত্মিক সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের পূজার গানে প্রকৃতির সেসব অনুষঙ্গ আলোচ্য প্রবন্ধে অনুসন্ধান করা হবে।

রবীন্দ্রনাথের পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের হাত ধরে ঠাকুরবাড়িতে সংগীতের যে বৃক্ষ অঙ্কুরিত হয়েছিল তা রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আনুকূল্যে পূর্ণপুষ্পে বিকশিত হয়েছিল। যার ফলশ্রুতিতে ঊনবিংশ শতকে কলকাতার সাংস্কৃতিক পীঠস্থানে পরিণত হয়েছিল ঠাকুরবাড়ি। ভারতবর্ষের বিখ্যাত সাহিত্যিক ও সংগীতবিদদের আনাগোনা ছিল ঠাকুরবাড়িতে। বাড়ির ছেলে-মেয়েদের সংগীত শিক্ষার জন্য জগৎখ্যাত শাস্ত্রীয় সংগীতের ওস্তাদ রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, বিষ্ণু চক্রবর্তী, যদুভট্ট, শ্রীকণ্ঠ সিংহ প্রমুখ। শৈশবে রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক সাহিত্যচর্চার আবহ ও সাংগীতিক পরিবেশ তাঁর সাহিত্যরচনা ও গীতরচনার ক্ষেত্রে অনুকূল ছিল। রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি ও ছেলেবেলার আত্মকথনে'র প্রথমেই তিঁনি বলেছেন- 'কবে যে গান গাহিতে পারিতাম না তাহা মনে পড়ে না।'[৩] তাঁর গান রচনার হাতেখড়ি হয় সেজদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছে। 'যদুভট্ট, রাধিকা গোস্বামী এবং সেই সময়কার বড় বড় ওস্তাদের মুখে তিনি খুব ভালো মানের ধ্রুপদ ও খেয়াল শুনতেন- তাঁর সেজদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই সুর নিয়ে পরীক্ষা করতেন, সেই সুরে রবীন্দ্রনাথকে গানের কবিতা লিখতে বলতেন।'[৪] এমনভাবেই সংগীতকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পথচলা শুরু। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সংগীত সাধনার বহুমাত্রিক প্রকাশ ঘটিয়েছেন গান রচনার ক্ষেত্রে।

যার মধ্যে 'পূজা' পর্যায় অন্যতম। ভাবকে উপলক্ষ করে বাণীর এক অসামান্য আবেদন আমরা তাঁর 'পূজা' পর্যায়ের গানে লক্ষ করি। তিনি পূজা পর্যায়ের গানে প্রকৃতিকে অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করেছেন যদিও গীতবিতানে 'প্রকৃতি' পর্যায় বলে একটি অনুবিভাগ আছে। প্রকৃতির সেসব অনুষঙ্গ কীভাবে পূজা পর্যায়ের গানে ঈশ্বরের বিরাটত্ব বা মহিমা প্রকাশে সহায়ক হয় তাই বিবেচিত হবে এই প্রবন্ধে।

পূজার গান রচনার প্রাসঙ্গিকতা ও পরিপ্রেক্ষিত

রবীন্দ্রনাথের গান রচনার সূত্রপাত বা সংগীতকার হিসেবে তার যে হাতেখড়ি সেটা হয়েছেই পূজা পর্যায়ের গান রচনার মাধ্যমে। কেননা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুরোধেই তাঁকে বেশিরভাগ সময় ব্রহ্মসংগীত বা ব্রহ্মোপাসনা উপযোগী গান লিখতে হয়েছিল। যেহেতু সংগীতকার হিসেবে তিনি তখনও পরিণত ছিলেন না, সুর সম্পর্কে তার প্রবল ধারণা ছিল না, ফলে হিন্দুস্তানী সংগীতের সুর তাকে আশ্রয় করতে হয়েছে এবং সেই শাস্ত্রীয় সংগীতের সুরে কথা বসিয়ে এমনকি কখনও-বা বাণীর ঝোঁকে বা ধ্বনিবিন্যাসে প্রভাবিত হয়ে তাকে পূজার গান রচনা করতে হয়েছে। 'সুখহীন নিশিদিন পরাধীন হয়ে ভ্রমিছ দীন প্রাণে'[৫], 'শূন্যহাতে ফিরি হে নাথ'[৬] প্রভৃতি গানগুলোতে আমরা খেয়াল করি তিনি হিন্দুস্তানি গানের বাণী বিন্যাসে ব্রহ্মসংগীত রচনা করেছেন। পরবর্তী সময়ে তিনি যখন সংগীতকার হিসেবে পরিণতি লাভ করলেন এবং তিনি তাঁর সমূহগানকে প্রকাশ করতে চাইলেন তখন তিনি তা কালানুক্রমিক বিন্যাসে প্রকাশ করলেন। তাঁর মনে হলো যে, কেউ তাঁর এ গানকে গীতিকবিতারূপেও পাঠ করে আস্বাদন করতে পারে সুরসহযোগ ব্যতিরেকে, সুরের মহিমা ছাড়া যেহেতু তাঁর গানের মধ্যে সেই সম্ভাবনা রয়েছে, বাণী বৈভব রয়েছে। ফলে তিনি আশাবাদী ছিলেন গীতিকবিতারূপেও তাঁর গানের বাণী পাঠকের মর্মস্পর্শ করবে। তখন তিনি এই বিন্যাসটি করলেন 'পূজা', 'প্রকৃতি', 'প্রেম', 'স্বদেশ', 'আনুষ্ঠানিক', 'বিচিত্র' ছয়টি পর্যায়ে। আমরা সেসকল গানকে বিবেচনা করব যেসকল গানকে আপাতদৃষ্টিতে আমাদের কাছে কেবলই প্রেমের বা কেবলই পূজার গান মনে হলেও তাঁর ভাবনায় ছিলেন ঈশ্বর। পূজা পর্যায়ের সেসব গানকে ঈশ্বর ভাবনার গান হিসেবে প্রাধান্য দিয়ে যেসব গানে ঈশ্বর বিভিন্ন নাম, সর্বনামে কীভাবে বিরাজ করছেন এবং ঈশ্বরের সেই ভাবনা প্রকাশে প্রকৃতি কীভাবে অনুষঙ্গ হিসেবে এসেছে বা প্রকৃতিকে কীভাবে ঈশ্বরভাবনার বহিঃপ্রকাশে রবীন্দ্রনাথ অনুষঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করেছেন সেই বিষয়টাই যাচাই করা এই প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য।

গবেষণার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

উনিশ শতকের বাংলা গানের অন্যতম প্রধান সংগীতকার, রবীন্দ্রনাথের পূজা পর্যায়ের গান আসলে বাঙালির যেকোনো দৈন্য থেকে, দুঃখ-শোক থেকে পরিত্রাণের উপায় হিসেবে বিরাজ করছে। ফলে এই গানের যে রহস্য উন্মোচন, এই গানের যে অর্থগত মহিমা, এই গানের যে অর্থ প্রকাশক অনুষঙ্গ সেই অনুষঙ্গগুলো বিবেচনা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ একটি বিষয়। এই প্রবন্ধে আমরা দেখব, রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর ভাবনার সঙ্গে কীকরে সমূহ ঈশ্বর জড়িত হয়ে যায়, সমূহ প্রকৃতি সম্পর্কিত হয়ে যায়। ঈশ্বরের একক ধারণা আমরা পেয়ে যাই নানারূপে, কখনও প্রেমিকসত্তারূপে, কখনো পাই প্রবল ঐশ্বরিক মহিমায়, কখনও পাই প্রকৃতি হিসেবে, কখনও ঝড় হিসেবে আসে। কখনও-বা নানা উপায়ে প্রাকৃতিক প্রবাহে আমাদের মনের মধ্যে ঐশ্বরিক অনুভূতি সঞ্চারিত হয়। এই গবেষণায়

রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু গান বেছে নেওয়া হয়েছে। যে গানগুলোর মধ্যে প্রাকৃতিক অনুষঙ্গ রয়েছে, যুগপৎ ঈশ্বর ভাবনা রয়েছে সে গানগুলো বিশ্লেষণ করে আমরা গবেষণাটি সম্পন্ন করেছি।

গবেষণা পদ্ধতি

এটি একটি গুণগত গবেষণা (Qualitative Research)। ফলে এই গবেষণা কর্ম সম্পাদনে 'পাঠ-বিশ্লেষণ পদ্ধতি' এবং 'বর্ণনামূলক পদ্ধতি' ব্যবহার করা হয়েছে। কখনো-বা তুলনামূলক পদ্ধতিরও প্রয়োগ ঘটাতে হয়েছে। রবীন্দ্র 'ঈশ্বর ভাবনা' কেবল তাঁর গানেই; বিশেষত 'পূজা' পর্যায় এবং ক্ষেত্র বিশেষে 'প্রকৃতি' পর্যায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁর রচিত নাটক এবং কাব্যগ্রন্থেও আমরা রবীন্দ্রউপলব্ধ ঈশ্বরকে খুঁজে পাই। উপরিউক্ত শিরোনামের গবেষণায় কেবলমাত্র 'গীতবিতানে'র পূজা পর্যায়ভুক্ত একুশটি উপপর্যায়ের উল্লেখযোগ্য গানকে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। 'পূজা' পর্যায়ের সেসব গানেই আলোকপাত করা হয়েছে, যেসব গানে প্রকৃতি অনুষঙ্গ হিসেবে উপস্থিত। গবেষণায় 'গীতবিতান'-কে আকর গ্রন্থ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের পূজা পর্যায়ের গানে প্রকৃতির অনুষঙ্গগুলো মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের পথে। প্রকৃতির অনুষঙ্গ রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরভাবনা ও তাঁর 'পূজা' পর্যায়ের গানে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তা বিশ্লেষণপূর্বক ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে এই প্রবন্ধে। প্রথমেই গানের বাণী বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং তারপর 'পূজা' পর্যায়ের গানে কীভাবে অনুষঙ্গগুলো এসেছে তা সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছে।

পূর্বগবেষণা সমীক্ষণ

গীতবিতানের 'পূজা' পর্যায় রবীন্দ্রনাথের এক অনন্য সম্ভার। রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কিত যে কোনো আলোচনা ও সমালোচনায় এই পর্যায় অর্ন্তভুক্ত না করলে ভাবার্থ সম্পন্ন হয় না। প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তীর *রবীন্দ্রসংগীতবীক্ষা: কথা ও সুর* গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের পূজা পর্যায়ের গান নিয়ে বিশদ আলোচনা থাকলেও পূজার গানে প্রকৃতি অনুষঙ্গ হিসেবে উপস্থিত এমন কোনো আলোচনা নেই। ড. অপূর্ব বিশ্বাসের *ঋতুসঙ্গীতে রবীন্দ্র-কবিমানস* গ্রন্থে প্রকৃতির অনুষঙ্গ রয়েছে এমনসব পূজার গানের উল্লেখ থাকলেও পূজার গানে প্রকৃতি অনুষঙ্গকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা হয়নি। সন্‌জিদা খাতুনের *রবীন্দ্রসংগীতের ভাবসম্পদ* গ্রন্থে রবীন্দ্রসংগীতের বিভিন্ন পর্যায়ের গানের মতো পূজা পর্যায়ের গানের বাণী বিশ্লেষণ থাকলেও পূজার গানের অনুষঙ্গ নিয়ে কোনো লেখা নেই। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের *কথা ও সুর* গ্রন্থে রবীন্দ্রসংগীতের বাণীবৈভব সর্ম্পকে স্পষ্ট করে কোনো ব্যাখ্যা দেননি। ফলত এই গ্রন্থেও পূজা পর্যায়ের গানে প্রকৃতি অনুষঙ্গ হিসেবে গুরুত্ব পায়নি। ড. ঝুমুর আহমেদের 'রবীন্দ্রনাথের পূজা পর্যায়ের গান: বাণী, সুর ও ছন্দ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ রয়েছে যেখানে পূজা পর্যায়ের গানের বাণী ও সুরের গুরুত্ব দিয়ে তাৎপর্য অনুসন্ধান করা হয়েছে। তবে তাতে পূজার গানের অনুষঙ্গসমূহ আলাদা গুরুত্ব দিয়ে বিচার করা হয়নি। তবে তাতে পূজার ভাব-নির্ধারক ভাবানুকূল শব্দসমূহ আলাদা করে যাচাই ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ফলে এই গবেষণায় 'পূজা'র গানে প্রকৃতি অনুষঙ্গ বিষয়টি বিবেচনায় আনা অভিনব।

গবেষণা-কর্মের তাৎপর্য

'সংগীত ও ভাব' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গান সর্ম্পকে বলেছেন- 'তাঁহারা গানের কথার উপরে সুরকে দাঁড় করাইতে চান, আমি গানের কথাগুলিকে সুরের উপর দাঁড় করাইতে চাই। তাঁহারা

কথা বসাইয়া যান সুর বাহির করিবার জন্য। আমি সুর বসাইয়া যাই কথা বাহির করিবার জন্য।'[৭] রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে বাণীকে এত বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। পূজা পর্যায়ের গানের বাণী বৈচিত্র্য বিশ্লেষণ করলে আমরা লক্ষ করব কবি প্রকৃতির অনুষঙ্গকে ব্যবহার করেছেন ঈশ্বর-ভাবনার পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটাবার জন্য। আমরা জানি রবীন্দ্রনাথের গান রচনার বাহন ছিল শাস্ত্রীয় সংগীতের সুর। 'পূজা' পর্যায়ের গানের বাণী-বৈভব ও অনুষঙ্গ অনুসন্ধান রবীন্দ্রপ্রেমী ও সংগীত রসিকদেও জ্ঞানের ঘাটতি পূরণে সমর্থ হবে। ঈশ্বরের মহিমা, বিরাটত্ব ও অস্তিত্বেও বহিঃপ্রকাশে রবীন্দ্রনাথ কোন কোন অনুষঙ্গগুলোকে 'পূজা' পর্যায়ের গানে প্রয়োগ করে গানের বাণীবৈচিত্র্যকে ফুটিয়ে তুলেছেন তার সন্ধান রবীন্দ্রসংগীত প্রসঙ্গকে আরো বেশি স্পষ্ট এবং গ্রহণযোগ্য করে তুলবে। সুতরাং রবীন্দ্রসংগীত প্রসঙ্গে আলোচ্য গবেষণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্য বহন করে।

পূজা পর্যায়ের গানে ঈশ্বর ও প্রকৃতি অনুষঙ্গ

ঈশ্বরসম্বন্ধীয় গানসমূহ 'পূজা' পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। 'পূজা'র গানের বাণী আমাদেরকে এক মিশ্র অনুভবের দ্বারস্থ করে। কখনো ঈশ্বরভাবনায় নিমজ্জিত করে, কখনো-বা সেই বাণীর মানবীয় প্রেমের অনুভূতির সঞ্চার ঘটে। 'পূজা' পর্যায়ের গানের বাণী সবই মিশ্র অনুভূতির সঞ্চারক। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পূজা' পর্যায়ভুক্ত গানগুলোকে মোট ২১টি উপপর্যায়ে ভাগ করেছেন। প্রকৃতি অনুষঙ্গ হিসেবে আছে 'পূজা' পর্যায়ের এমন গানগুলোকে বিবেচনায় নিয়ে সুক্ষ্ম বিশ্লেষণপূর্বক পূজার গানে প্রকৃতি অনুষঙ্গ অনুসন্ধান করব।

শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝড়ে, পড়ুক ঝরে
তোমারি সুরটি আমার মুখের 'পরে, বুকের 'পরে ॥[৮]

'শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে, পড়ুক ঝরে' গানের বাণীতে একটি আবেগময় অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে। এই গানের বাণী উপলব্ধি করলে দেখব, যেমন করে শ্রাবণ মাসে (বর্ষাকালে) বৃষ্টিধারা ঝরে পড়ে, তেমনি করে কোনো এক অনুভূতি, ভালোবাসা বা স্মৃতি যেন একে একে ঝরে পড়তে থাকে। এটি আক্ষেপ, দুঃখ বা কোনো অভিমানও হতে পারে, যা ধীরে ধীরে যেন মুছে যায় বা দূরে চলে যায়। বৃষ্টির ধারার মতো স্নিগ্ধতা নিয়ে, সহজেই হারিয়ে যায়, কোনো কঠিন অনুভূতির গভীরতা বা যন্ত্রণা কমাতে। কবির বয়স যখন ৫২ বছর তখন কবি এই গানটি রচনা করেন। তাঁর ছোটো ছেলে সৌমেন্দ্রনাথ আকস্মিকভাবে মারা যান ১৯১৪ সালে। যার মধ্যে কবির ছায়া কবি অবলোকন করেছিলেন। পুত্রশোকে হববিহ্বল কবি এই গানের মধ্যে দিয়েই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছেন পুত্র হারানোর পাহাড়সম বেদনা থেকে পরিত্রাণ পেতে। মূলত এই গানে কবি মনস্তাত্ত্বিক আবেগকে প্রকাশ করেছেন, যেখানে মানুষ তার দুঃখ, কষ্ট এবং শোককে ধীরে ধীরে মেনে নেয় এবং প্রাকৃতিকভাবেই তা দূরে চলে যায়। এই গানটি 'পূজা' পর্যায়ের 'প্রার্থনা' উপপর্যায়ভুক্ত।

এই গানে কবি তাঁর মনের অনুভূতিকে প্রকাশ করতে আশ্রয় নিয়েছেন প্রকৃতির অন্যতম অনুষঙ্গ 'বর্ষা'কে। শ্রাবণ, ধারা, বাদল এই শব্দগুলো প্রবলভাবে 'বর্ষাঋতু'কে প্রকাশ করে। বর্ষার বৃষ্টি যেমন প্রকৃতিকে এক নতুন প্রাণ দেয়, বসন্তে ঝরে পড়া শাখায় নতুন পল্লবের উপস্থিতি ঘটায়, শীর্ণপল্লব হয়ে ওঠে সজীব তেমনি করে কবিও বর্ষার ধারার মতো জীবনে ঈশ্বরের করুণা লাভ করে জীবনকে প্রাণশক্তিতে বলবান করতে চেয়েছেন।

আমি মারের সাগর পাড়ি দেব বিষম ঝড়ের বায়ে
আমার ভয়ভাঙ্গা এই নায়ে ॥[৯]

'দুঃখ' উপপর্যায়ভুক্ত এই গানটি কবি 'বাউল' রাগের আশ্রয়ে রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের গানগুলো লক্ষ করলে আমরা দেখব তিনি কাব্যের সকল জটিলতাকে ত্যাগ করে গানকে রূপ দেয়ার নিরিখে বাণীবদ্ধ করেছেন। এই বয়সে কবি কথা ও সুরের অর্ধনারীশ্বর সুষমাকে বিবেচনায় নিয়ে গান রচনা করেছেন। সারি গানের প্রভাবযুক্ত এই গানে কবির ঈশ্বরের উপর আশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখতে পাই। তিনি কর্মে বিশ্বাসী এবং ঈশ্বরের চাওয়াই যে বেলাশেষে আমাদের জীবনকে পূর্ণ করে তা তিনি সঞ্চারিতে প্রকাশ করেছেন–

পথ আমারে সেই দেখাবে যে আমারে চায়–
আমি অভয় মনে ছাড়ব তরী, এই শুধু মোর দায়।[১০]

এই গানেও আমরা প্রকৃতির অনুষঙ্গ হিসেবে 'ঝড়'কে পাই। জীবনের কঠিনতম সময়েও আপনমনে ঈশ্বরের ভরসায় কৃতকর্ম সম্পাদন করার কথাই মূলত এই গানের উপজীব্য। রবীন্দ্রনাথের জীবনে দুঃখ-বেদনা যখন গ্রাস করেছিল তখন তিনি নিজেকে প্রাণিত করেছেন। এখানেও ঈশ্বরভাবনায় প্রকৃতি অনুষঙ্গ হিসেবে এসেছে।

আমি যখন ছিলেম অন্ধ
সুখের খেলায় বেলা গেছে, পাই নি তো আনন্দ ॥[১১]

এই গানে কবি গভীর আত্মাঅন্বেষণের কথা বলেছেন, যেখানে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে যাত্রা, সুখ এবং দুঃখের মিশ্রণ এবং শেষমেশ ঈশ্বর বা সত্তার সঙ্গে মিলনের অনুভূতি ফুটে উঠেছে।

গানের শুরুতেই কবি ঈশ্বরের কাছে নিজের চেতনাহীনতার কথা স্বীকার করেছেন। বাহ্যিক বন্ধন ভেঙে যখন তাঁর আত্মার মুক্তি মেলে তখন বাহ্যিক সুখ আর তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। গানের অন্তরায় সেই কথাটিই তিনি বলেছেন-

ভিত ভেঙে যেই এলে ঘরে ঘুচল আমার বন্ধ।
সুখের খেলা আর রোচে না, পেয়েছি আনন্দ ॥[১২]

মৃত্যুশয্যায় রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুভাবনা প্রকাশে প্রকৃতির দ্বারস্থ হলেন। মৃত্যুই সৃষ্টি আর স্রষ্টার মিলনের পথকে একত্রিত করে। যাপিত জীবনের ভারে মানুষ ঈশ্বরের আরাধনায় মগ্ন হতে পারে না। সংসার ভার পরমের আশ্রয়ে যেতে একমাত্র বাধা। তাই তো তিনি মৃত্যুকেই চেয়েছেন জীবনের সেই আকাঙ্ক্ষিত আনন্দ লাভের আশায়। আভোগ অংশে তারই বর্ণনা আমরা পাই।

যে দিন তুমি অগ্নিবেশে সব-কিছু মোর নিলে এসে
সে দিন আমি পূর্ণ হলেম ঘুচল আমার দ্বন্দ।[১৩]

এই গানের বাণীবৈভব প্রকাশে 'প্রকৃতি' গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হিসেবে উপস্থিত। প্রকৃতির কিছু অনুষঙ্গ যেমন আলোক, অন্ধকার এবং ধ্বংস বা সৃষ্টির বিষয় গানে আধ্যাত্মিক পরিবর্তন ও অনুভূতি প্রকাশে ব্যবহৃত হয়েছে।

গানের প্রথম স্তবকে কবি 'আমি যখন ছিলেম অন্ধ' বলে উল্লেখ করেছেন, যা অন্ধকারের প্রতীক। মানুষ বা আত্মার সত্য এবং সুন্দরের পথ খুঁজে না পাওয়ার অন্তরায় হিসেবে 'অন্ত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এরপর 'যে দিন তুমি অগ্নিবেশে' উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে 'অগ্নিবেশ' শব্দটি আলোর এবং শক্তির প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে, অন্ধকার থেকে সত্যের পথে পরিত্রাণ ঘটেছে, যা প্রকৃতির পরিবর্তনের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

এছাড়া 'অগ্নিবেশ' এবং 'রুদ্র' শব্দ দুটি প্রকৃতির শক্তির প্রতিনিধিত্ব করে। 'রুদ্র' শব্দটি শিবের এক রূপ, যিনি প্রাকৃতিক শক্তির উগ্রতার সাথে সম্পর্কিত। এখানে প্রকৃতি একটি শক্তিশালী, উগ্র শক্তি হিসেবে উপস্থিত, যা মানুষের জীবনকে পরিবর্তন করে, পরিশুদ্ধ করে এবং এক নতুন ছন্দে আনে।

'ভিত ভেঙে যেই এলে ঘরে' এবং 'ঘুচল আমার বন্ধ'- এই শব্দগুলো প্রকৃতির ধ্বংস এবং সৃষ্টির চিত্র তুলে ধরে। যেমন, একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা উগ্র শক্তি পৃথিবীতে ধ্বংস সৃষ্টি করতে পারে, তেমনি সেই ধ্বংসের পর নতুন কিছু সৃষ্টি হতে পারে। অর্থাৎ, সত্যের পথ জীবনের সকল সীমাবদ্ধতাকে ভেঙে জীবনকে শুদ্ধ এবং পূর্ণ করে।

প্রকৃতির শক্তির মাধ্যমে কবি নিজের অন্তরের গহীনে একটি পরিবর্তন অনুভব করছেন, যা তাকে সত্য, আনন্দ, এবং মুক্তির দিকে পরিচালিত করেছে। এই গানটি আধ্যাত্মিক পথের একটি চিত্র। দুঃখ, সুখ, ব্যথা, এবং আনন্দের মধ্য দিয়ে তিনি একটি গভীর উপলব্ধি অর্জন করেছেন, যেখানে তিনি তাঁর দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি পেয়েছেন এবং শান্তি লাভ করেছেন। এই গানে ঈশ্বরকে আলাদা করে কোনো সর্বনামে সম্বোধন করা হয়নি।

'বাউল' উপপর্যায়ের এই গানে রবীন্দ্রনাথ অগ্নিকে মৃত্যুর রূপক রূপে ব্যবহার করেছেন। শবদাহে অগ্নি যখন মানুষকে ভস্ম করে দেয়, তখন পার্থিব জীবনের কোনো বাধা ঈশ্বরের সাথে সৃষ্টির মিলনে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় না।

বরিষ ধরা-মাঝে শান্তির বারি
শুষ্ক হৃদয় লয়ে আছে দাঁড়াইয়ে
ঊর্ধ্বমুখে নরনারী ॥[১৪]

'প্রার্থনা' উপপর্যায়ভুক্ত এই গানে যেকোনো শ্রোতাকে বর্ষার আবহে নিমজ্জিত করবে। স্রষ্টার কাছে শান্তির বারি রূপে কবি আশীর্বাদ চেয়েছেন। কেবলমাত্র ঈশ্বরের বাণীই আমাদেরকে সকল প্রকার বিদ্বেষ থেকে দূরে রাখতে পারে। এই গানে ঈশ্বরপ্রেম এবং মানবপ্রেম একাকার হয়ে গেছে। প্রেমই যে পারে সবকিছুর ঊর্ধ্বে নিয়ে মানবেব জয়কার স্থাপন করতে। 'বরিষ', 'বারি', শব্দদ্বয় প্রকৃতির অনুষঙ্গ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে এই গানে।

যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে
জানি নাই তো তুমি এলে আমার ঘরে ॥[১৫]

'দুঃখ' উপপর্যায়ভুক্ত এই গানটি রবীন্দ্রনাথ বাগেশ্রী রাগে বেঁধেছেন। বাগেশ্রী রাগের করুণ রসাত্মক আবেদন এই গানে স্পষ্ট। 'রবীন্দ্রনাথ' এবং 'মৃত্যু' যেন একে অপরের পরিপূরক। মা, বৌঠান, স্ত্রী, ছেলে এবং মেয়ের মৃত্যু তাকে ভিতর থেকে ভেঙে দিয়েছিলো। রবীন্দ্রনাথ দুঃখবোধ থেকে এই গান রচনা করেছেন। এখানে প্রকৃতির অনুষঙ্গ হিসেবে ঝড় শব্দটি এসেছে। ঝড় যেমন সাজানো বাগানকে তছনছ করে দিয়ে যায় তেমনি প্রিয়জনের মৃত্যু রবীন্দ্রনাথের জীবনে এক অস্বাভাবিক বেদনার আভাস বয়ে এনেছে। সব কেড়ে নিলেও ঈশ্বর তার করুণার ধারা কবিজীবনে অবারিত রেখেছেন তা কবি অবলোকন করেছেন। যার বর্ণনা আভোগ অংশে লক্ষণীয়।

সকালবেলা চেয়ে দেখি, দাঁড়িয়ে আছ তুমি এ কি,
ঘর-ভরা মোর শূন্যতারই বুকের পরে ॥[১৬]

একমাত্র ঈশ্বরই আমাদের পরম বন্ধু, যিনি 'অনাথের নাথ'। শূন্যতার বুকে পরম নির্ভরতা নিয়ে তিনি সবসময় মানবের মাঝে বিরাজমান।

আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে
বসন্তের এই মাতাল সমীরণে ॥"[১৭]

এই গানে প্রকৃতি একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হিসেবে এসেছে, যা কবির মানসিক অবস্থার প্রতিফলন। পুত্র সৌমেন্দ্রনাথের শবদাহ শেষে ট্রামে করে ফেরার পথে কবি আকাশে বিশাল এক চাঁদ দেখলে, চাঁদের আলোর এক নৈসর্গিক সৌন্দর্য যেন উপচে পড়ছে। কিন্তু কবির মন তখন পুত্র হারানোর বেদনায় দিকহারা। এই গানে কবি ঋতুরাজ 'বসন্ত'কে তার মনের ভাব প্রকাশক অনুষঙ্গ হিসেবে বেছে নিয়েছেন। এখানে বসন্তকাল ও প্রকৃতির সৌন্দর্য কবির আবেগের সঙ্গে মিলিত হয়ে তার অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশ করেছে।

প্রকৃতির বিশেষ উপাদান যেমন 'জ্যোৎস্নারাতে', 'বসন্তের মাতাল সমীরণ' এবং 'বনে যাওয়া', এসব গানের বাণীতে প্রকৃতির এক উন্মুক্ত এবং জীবন্ত রূপ তুলে ধরা হয়েছে। বসন্তের বাতাস এবং জ্যোৎস্নার আলো একদিকে মানুষের আবেগকে উদ্দীপ্ত করে, অন্যদিকে কবি তা থেকে সরে থাকতে চান। প্রকৃতি তার প্রতি আকর্ষণ তৈরি করলেও কবি একাকী থাকতে চান, নিজের ঘরে। 'রইনু পড়ে ঘরের মাঝে' এবং 'যাব না গো' বাক্যগুলো কবির অন্তর্মুখিতা এবং একাকিত্বের ইঙ্গিত দেয়, যা প্রকৃতির উচ্ছ্বাসের বিপরীত। ঘরের মধ্যে থাকাটাই যেন তার শান্তি ও আত্মবিশ্লেষণের স্থান, যেখানে প্রকৃতির অস্থিরতা তাকে বিভ্রান্ত করতে পারে। প্রকৃতির উত্তেজনা তাকে এক ধরনের আবেগের স্রোতে ভাসিয়ে দিতে চাইলেও, কবি নিজেকে শান্ত রাখতে চান।

এভাবে, প্রকৃতি কবির অভ্যন্তরীণ মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা এবং দ্বন্দ্বের প্রতীক হিসেবে এসেছে, যা কবির একাকিত্ব, শান্তি এবং আত্মবিশ্লেষণের সাথে সম্পর্কিত। 'পূজা' পর্যায়ের এই গান 'বিরহ' উপপর্যায়ভুক্ত।

কে বসিলে আজি হৃদয়াসনে ভুবনেশ্বর প্রভু,--
জাগাইলে অনুপম সুন্দর শোভা হে হৃদয়েশ্বর ॥[১৮]

মাত্র ৩৬ বছর বয়সে লেখা এই গানে কবি, ঈশ্বরের মহিমা এবং তাঁর করুণাধারার অসীম প্রাচুর্যের কথা তুলে ধরেছেন, যা মানুষের হৃদয়কে পূর্ণ করে। ঈশ্বরের উপস্থিতি কঠিন ও অন্ধকার সময়েও জাগায় নব উদ্দীপনা এবং জীবনে সঞ্চারিত হয় সুন্দরের শোভা তারই বারতা কবি অন্তরায় দিয়েছেন– 'সহসা ফুটিল ফুলমঞ্জরী শুকানো তরুতে'।[১৯]

কবি অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর দৃশ্য বর্ণনা করেছেন, যেখানে শুকানো গাছ থেকে ফুলের মঞ্জরী হঠাৎ ফুটে উঠেছে। কবি এখানে প্রকৃতিকে বেছে নিয়েছেন প্রতীকী রূপে, যেখানে জীবনের অন্ধকার বা কঠিন সময়েও ঈশ্বরের উপস্থিতি সবকিছু নতুন করে জাগিয়ে তোলার বার্তা পৌঁছে দেয়। পাষাণের মনেও প্রেমের সঞ্চার ঘটতে পারে যদি ঈশ্বর অনুভবে আসেন। ঈশ্বরের অকৃপণ কৃপা শূন্য জীবনকেও যে ভালোবাসায় পূর্ণ করে দিতে পারে তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এই চরণে।

এই গানে, কবি ঈশ্বরকে 'প্রভু' বলে সম্বোধন করেছেন, যা তাঁর বিরাটত্ব এবং রাজাধিরাজ সত্ত্বার প্রকাশ ঘটায়। ঈশ্বরকে তিনি 'হৃদয়েশ্বর' বলেও সম্বোধন করেছেন। এই সর্বনামটি মানুষের অন্তরে তাঁর অবস্থানকে বোঝায়।

এই গানে 'প্রকৃতি' বিশেষ অনুষঙ্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে ঈশ্বরের মহিমার চিত্রপট ফুটিয়ে তুলতে।

শূন্য হাতে ফিরি, হে নাথ, পথে পথে—ফিরি হে দ্বারে দ্বারে—
চিরভিখারি হৃদ মম নিশিদিন চাহে কারে[২০]

এ গানের বাণী এক গভীর আত্মজিজ্ঞাসার প্রকাশ। কবি জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব, দুঃখ, তৃষ্ণা, শূন্যতা, এবং এক অপ্রাপ্তির পথে হাঁটতে হাঁটতে শেষ পর্যন্ত শান্তি ও তৃপ্তি খুঁজেছেন। মূলত, এই গানের মাধ্যমে কবি জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব, শূন্যতা, এবং অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষার চিত্র তুলে ধরেছেন।

এই গানে কবি ঈশ্বরকে 'নাথ' বলে সম্বোধন করেছেন। 'হে নাথ' বলতে কবি ঈশ্বরকে ডাকছেন, যিনি তার জীবনের পথপ্রদর্শক। এ ছাড়া, পুরো গানে ঈশ্বরের আর কোনও সরাসরি সর্বনাম ব্যবহৃত হয়নি, তবে কবি ঈশ্বরের উপস্থিতি বা করুণা অনুভব করার চেষ্টা করেছেন। 'নাথ' শব্দটি ঈশ্বরের প্রতি এক ধরনের আর্জি ও প্রেমের চিহ্নও বটে।

কবির আত্মস্থতাকে বা তাঁর দুঃখবোধকে প্রকাশ করতে 'প্রকৃতি'র বিভিন্ন উপাদান গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, অন্ধকার, সন্ধ্যা এবং পথ। কবির অন্তরের অস্থিরতা, শূন্যতা, এবং অনন্ত যাত্রার প্রতীক হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে প্রকৃতির এই অনুষঙ্গগুলি। এখানে প্রকৃতি মানুষের জীবনের অনিশ্চয়তা, সময়ের গতি, এবং মানসিক অবস্থা উপলব্ধি করতে সাহায্য করছে। 'আসে তিমিরযামিনী, ভাঙিয়া গেল মেলা'[২১] চরণের মাধ্যমে প্রকৃতির অন্ধকার অংশকে তুলে ধরা হয়েছে। তিমিরযামিনী আসার পর মেলা ভেঙে যায়, যা জীবনের এক সময়ের শেষ এবং অনিশ্চয়তার চিহ্ন।

কোথা জ্বলে গৃহপ্রদীপ কোন্ সিন্ধুপারে[২২]

এখানে 'গৃহপ্রদীপ' শব্দটি প্রকৃতির আলোর সাথে সম্পর্কিত, যেটি কবি খুঁজছেন। এটি রূপক অর্থে সেই শান্তি বা তৃপ্তির প্রতিনিধিত্ব করে যা কবি চান, তবে তিনি জানেন না কোথায় তা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। 'সিন্ধুপারে' এখানে মহাকাব্যিক পরিসীমাকে ইঙ্গিত করে, যেখানে কবি তার পথ খুঁজছেন, কিন্তু তা অনিশ্চিত।

সকল যাত্রী চলি গেল, বহি গেল সব বেলা[২৩]

বেলা (সময়) এবং যাত্রী (পথচারী) শব্দগুলি প্রকৃতির সময়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। এখানে সময়ের গতি এবং মানুষের যাত্রা যেমন অনন্ত, তেমনি প্রকৃতির মধ্যে সময়ের ধারাও অব্যাহত থাকে।

'বিবিধ' উপপর্যায়ভুক্ত এই গানে 'প্রকৃতি' কবির জীবনের পরিস্থিতির প্রতীক হয়ে এসেছে। যেখানে অন্ধকার, সময়ের প্রবাহ, এবং নির্দিষ্ট গন্তব্যের অনিশ্চিয়তা– এগুলি একে অপরের সাথে মিলিত হয়ে কবির জীবনের অবস্থা এবং অভ্যন্তরীণ যাত্রার প্রতিফলন ঘটিয়েছে।

উপসংহার

গীতবিতানের পূজা পর্যায়ভুক্ত গানগুলোকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখব, রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে ঈশ্বরকে বিরাটত্বের অংশ হিসেবে তাঁর গানে প্রকাশ করলেও সেখানে মাধুর্যের উপস্থিতিও লক্ষণীয় ছিল। উপরের বিশ্লেষণ বিবেচনা করলে আমরা কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। প্রথমত, প্রথম জীবনের পূজার গানে ধ্রুপদী গানের প্রভাব থাকলেও পরবর্তী সময়ে প্রৌঢ়

এবং পরিণত বয়সের পূজার গানগুলি ছিল সম্পূর্ণ সক্রিয়-বৈশিষ্ট্যের গান। দ্বিতীয়ত, প্রথম দিককার গানগুলোতে ব্রহ্মোপাসনার উপযোগী বাণী-বিন্যাস থাকলেও পরবর্তীতে তাঁর পূজার গানে কেবল ঈশ্বরবন্দনার একক অনুভূতিতে মুখর ছিলো না, কখনও কখনও পূজা ও প্রেম পর্যায়ের গান একাকার হয়েছে যদিও গীতবিতানে গানগুলোর পর্যায় স্পষ্ট করা আছে। আমরা আরও লক্ষ করেছি, পূজার গানে কবি ঈশ্বরকে নানা সর্বনামে অভিবাদন জানিয়েছেন। সেইসব ভাবার্থক শব্দকেও আমরা পূজার গানের অনুষঙ্গ বিবেচনা করি।

তথ্যনির্দেশ

১ যিনি একই সাথে গীত রচনা ও সুরারোপে পারদর্শী।

২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান* (কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থণবিভাগ, সংস্করণ পৌষ ১৩৮০), পৃ. ৫

৩ তদেব, পৃ. ১৭৫

৪ ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, 'কথা ও সুর', *ধূর্জ্জটিপ্রসাদ রচনাবলী তৃতীয় খণ্ড* (সং; কলকাতা : দে'জ পাবলিকেশন্স, ১৯৮৭), পৃ. ৯৯

৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৬

৬ তদেব, পৃ. ১৬৪

৭ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সংগীতচিন্তা* (কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থণবিভাগ, অগ্রহায়ণ সংস্করণ ১৩৯৯), পৃ. ২৭২

৮ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫

৯ তদেব, পৃ. ৮৯

১০ তদেব

১১ তদেব, পৃ. ২১৮

১২ তদেব

১৩ তদেব

১৪ তদেব, পৃ. ৫৮

১৫ তদেব, পৃ. ৯৭

১৬ তদেব

১৭ তদেব, পৃ. ৬৭

১৮ তদেব, পৃ. ১৭৭

১৯ তদেব

২০ তদেব, পৃ. ১৬৪

২১ তদেব

২২ তদেব

২৩ তদেব